Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-IV, July 2024, Page No.55-63
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মধুসূদনের জীবনে ও কর্মে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকা

প্রভাত দাস
সহকারী অধ্যাপক ,বাংলা বিভাগ, নূর মহম্মদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, ডাকবাংলো, ধুলিয়ান, ফারাক্কা, মুর্শিদাবাদ

অমৃতা চক্রবর্তী
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, নুর মোহম্মদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, ডাকবাংলো, ধুলিয়ান, ফারাক্কা, মুর্শিদাবাদ

Abstract:
Michael Madhusudan and Vidyasagar are two leaders of Bengal enlightened in the light of the 19th century renaissance. One was born in the mouth of a golden spoon and endured the burning of poverty in the irony of fate. Another fought with poverty for a lifetime and became an ' ocean of kindness ' by the side of the crying people .A friendship developed between these two people of completely opposite poles in terms of nature. But was that relationship lifelong? Vidyasagar had a place in the tent poetry as well as in the heart of the poet Madhu. Again, this lion man stood next to the helpless Madhusudan in exile. Thus these two luminaries of the 19th century came close to each other. Melted in respect. The history of Bengal has been stirred by these two works, Paush Fagun Pala of Bengali relations.
Keywords: Friendship, Michael Madhusudan, Vidyasagar, Renaissance, Lifelong relationship.

ঊনবিংশ শতকজুড়ে বাংলা মায়ের কোল আলো করে একঝাঁক কৃতি বাঙ্গালীর জন্ম হয়েছিল যাঁরা তাদের শিক্ষায়, ভাবনায়, চেতনায় এককথায় নবজাগরণের আলোতে নিজেরা আলোকিত হয়ে সেই আলোক শিখা প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন স্ব-স্ব ক্ষেত্রে। সমাজ থেকে সাহিত্য বিজ্ঞান সর্বত্র তাদের গতায়ত। প্রায় সমসাময়িক এমনই দুই কৃতি সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত। একজন সমাজসংস্কারক ছাড়াও বাংলা গদ্যের জনক, অন্যজন বাংলা কাব্যের ভগীরথ। মধুসূদন সম্পর্কে বন্ধু রাজনারায়ণ বসু তাঁর ‘বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে’ বাংলা ভাষার যুগপ্রবর্তক কবিদের কাল নির্নয় প্রসঙ্গে বলেছেন প্রথম বিদ্যাপতি, দ্বিতীয় কবিকঙ্কনের এবং তারপর মধুসূদনের কাল নির্দেশ করেছেন। রায়গুনাকর ভারতচন্দ্র এবং যুগসন্ধিক্ষনের কবি ঈশ্বরগুপ্তের আদর্শে বঙ্গদেশে একসময় নতুন শ্রেণির সাহিত্য উদ্ভূত হয়েছিল। মধুকবি গুপ্তকবির ব্যঙ্গরস প্রধান যমকানুপ্রাস প্লাবিত কবিতার প্রাধান্য বিলুপ্ত করে বঙ্গসাহিত্যে বিশেষত

কবিতা ও নাটকে এক নতুন পথ প্রদর্শন করলেন। অন্যদিকে বীরসিংহের সিংহ যাঁকে অনেকে 'যশুরে কৈ' বলে ব্যঙ্গ করতেন সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুধুমাত্র বর্ণপরিচয়ের মধ্যে দিয়ে বাঙ্গালীকে অক্ষর শিক্ষা দিলেন তা নয়; তিনি একদিকে যেমন বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করেন তেমনি নারীশিক্ষার আলো বিতরন করেন,সমাজ সংস্কারে জড়িত থাকেন তেমনই বাংলা গদ্যের কাঠামোও তিনি নির্মান করেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় 'বাংলা গদ্যের যথার্থ শিল্পী'। এর বাইরে বিদ্যাসাগরের অপর এক পরিচয় তিনি 'দয়ার সাগর'। অথচ প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্যাসাগর আর মধুকবির মধ্যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ চলত। মধুকবির কাছে বিদ্যাসাগর নিছক 'টুলো পন্ডিত' আর মধুকবির অমিত্রাক্ষর ছন্দ বিদ্যাসাগরের কাছে 'অসহ্য'।

প্রথম দিকে মধুসূদন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একে অপরকে অপছন্দ করতেন। মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে 'টুলো পন্ডিত' বলে ডাকতেন। বিদ্যাসাগরও মধুসূদনকে 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' নিয়ে ব্যঙ্গ করতে ছাড়তেন না। 'তিলোত্তমা বলে শুন দেবরাজ/ তোমার সঙ্গেতে আমি কোথায় যাইব?' মধুসূদন তার ত্রাতা ও বন্ধুর প্রতি ছিলেন পরম শ্রদ্ধাশীল। 'ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর' ও 'পন্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর' বলে দুটি কবিতা লিখে বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। কবির ভাষায় –

> 'বিদ্যারসাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে
> করুনার সিন্ধু তুমি সেই জানে মনে
> দীন যে দীনের বন্ধু।'

সাহিত্যচর্চার দিক থেকে মাইকেলের প্রথম ও প্রধান পৃষ্টপোষক বিদ্যাসাগর। অথচ কী আশ্চর্য, এই টুলো পণ্ডিতই একসময় হয়ে উঠলেন ভীষন কাছের মানুষ, পরম বন্ধু সেইসঙ্গে 'বন্ধুত্রাতা'। অন্যদিকে মধুকবিও ব্যারিস্টারি পাশ করে বিদ্যাসাগরকে লেখা চিঠিতে বিদ্যাসাগরের সাহায্যের কথা স্বীকার করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লিখেছিলেন- ' আমি নিশ্চিত আপনি জেনে দারুণ খুশি হবেন যে, গতরাতে গ্রেজ ইন সোসাইটি আমাকে বার-এ ডেকে পাঠিয়েছিল এবং আমি অবশেষে ব্যারিস্টার হয়েছি এর সবকিছুর জন্যে আমি ঋণী প্রথমে ঈশ্বর এবং তাঁর নীচে আপনার কাছে এবং আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, আমি চিরদিন আপনাকে আমার সবচেয়ে বড় উপকারী এবং সবচেয়ে খাঁটি বন্ধু বলে বিবেচনা করব। ...প্রিয় বিদ্যাসাগর আপনি ছাড়া আমার কোনো বান্ধব নেই।'১ 'টুলো পন্ডিত' বিদ্যাসাগর, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মধুসূদনের কতটা কাছের ছিলেন এই পত্রই তার প্রমান। এই দুই স্বারস্বতের পরস্পরকে শ্রদ্ধার বিপদের দিনে পাশে থাকার নিদর্শন অজস্র ছড়িয়ে আছে; সেগুলি একত্রিত করার আগে আমাদের একটু আলোকপাত করতে হবে মধুকবির ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের উপর। প্রবাসে বিষম দারিদ্র্য ও অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে মধুসূদন বুঝেছিলেন জেদী ব্রাক্ষ্মণটি শুধু বিদ্যাসাগর নন, করুণার সাগর ও বটে।

১৮২৪ খ্রীঃ এর ২৫ শে জানুয়ারী শনিবার বাংলার ১২৩০ সালের ১২ই মাঘ আধুনিক যশোহরের অন্তর্গত কপোতাক্ষ নদীর তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে কবির জন্ম। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত মাতা জাহ্নবীদেবী দানশীলতা সৌজন্য অতিথি অভ্যাগতদের সেবা প্রভৃতি সদ্গুনের পাশাপাশি দত্ত পরিবারে যে দোষগুলি বর্তমান ছিল তা হল অমিতব্যায়িতা, ইন্দ্রিয়সংযমের অভাব, বিলাসিতা, আত্মশ্লাঘা। আত্মসংযমেই যে প্রকৃত

মনুষ্যত্ব,পিতাও পুত্রের দুজনের সে জ্ঞান ছিল না। তার উপর বিত্তবৈভবের প্রাচুর্য্য এবং গুরুজনদের অবাধ প্রশ্রয়ে মধুসূদনের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। তার ফলে একটা স্বেচ্ছাচার তার মধ্যে দেখা গিয়েছিল। মধুসূদনের জন্মের চার বৎসরের মধ্যে তাঁর অন্য দুইভাই প্রসন্নকুমার ও মহেন্দ্রনারায়নের অকাল মৃত্যু ঘটে। ফলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন পরিবারের আদরের নিধি। মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু এ প্রসঙ্গে লিখেছেন- 'শৈশবে গুরুজনদিগের এইরূপ প্রশ্রয় দানের ফল এই হইয়াছিল যে, বাল্যকাল হইতেই মধুসূদন স্বেচ্ছাচারে অভ্যাস্ত হইয়াছিল; এবং সেইজন্য উত্তরকালে যে কাজ তাঁহার ভালো বোধ হইত, সঙ্গত হউক, আর অসঙ্গতই হউক, সহস্র নিবারণ সত্ত্বেও, তিনি তাহা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেন না।২

কবির শৈশবে অর্জিত অমায়িকতা, সহৃদয়তা, পরদুঃখ কাতরতা প্রভৃতি গুণের পরিবর্তন পূর্ণ বয়সেও হয়নি। মাদ্রাজ ও ইউরোপ প্রবাসকালে অর্থাভাবে যখন বিপর্যস্ত তখনও নিতান্ত হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের ন্যায় অকারণে অথবা সামান্য কারণে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। অনেক ভালো কাজেও তিনি অর্থ দান করতেন অর্থের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র মমতা ছিল না। অথচ সারাজীবন ধরে অর্থকষ্টে কবির জীবন অতিবাহিত হল, স্বর্গীয় মনমোহন বসু যিনি আমৃত্যু কবির সঙ্গ ছাড়েননি; তিনি বলতেন যে কাউকে সাহায্য করার সময় মধুসূদন গুনে টাকা দিতেন না। এক মুষ্ঠি বা দ্বিমুষ্ঠিতে যা উঠত তাই দিতেন; অথচ এই মানুষটিকেই প্রবাসে সে (মাদ্রাজে কিংবা ইংল্যান্ড) অর্থের অভাবে কী ভয়ঙ্কর দিন কাটাতে হয়েছে। আর সেখানেই ত্রাতারূপে আরেক বাঙ্গালীর আবির্ভাব তিনি বিদ্যাসাগর। অধ্যয়ন শক্তি, কাব্যানুরাগ, উচ্চাভিলাষ, সেই পাঠশালায় পড়ার সময় থেকেই মধুসূদনের প্রকৃতিতে গেঁথে গিয়েছিল। ছাত্রাবস্থায় হিন্দুকলেজে যেভাবে যত্নসহকারে গ্রন্থাভ্যাসে লিপ্ত ছিলেন মাদ্রাজে হাজার প্রতিকূলতার মধ্যেও সেই অভ্যাস একটুও ম্লান হয়নি। সংস্কৃত, গ্রীক,পারসিক, ল্যাটিন, ফরাসী, জার্মান, ইতালী আটটি ভাষায় তিনি ছিলেন সুপন্ডিত। নানাদেশীয় কাব্যশাস্ত্রের অনুশীলনে বঙ্গদেশে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় হিন্দুকলেজের তারকা ছাত্রদের মধ্যে বৃহস্পতি। সাহিত্য সেবক মধুসূদন দর্পিত কন্ঠে বলেছিলেন- 'সেক্সপীয়ার চেষ্টা করিলে নিউটন হইতে পারিতেন, কিন্তু নিউটন চেষ্টা করিলে কখনও সেক্সপীয়ার হইতে পারিতেন না।' হিন্দুকলেজের শিক্ষকদের মধ্যে তাঁর আদর্শ ছিল রিচার্ডসন। বায়রন স্কট ও মূর এই তিনকে আদর্শ করেই সাহিত্য রচনায় তাঁর পদার্পন। হিন্দু কলেজের অন্য অনেক ছাত্রের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন বাংলা ভাষা অশিক্ষিত বর্বরের ভাষা। ইংরাজি সাহিত্যে দিকপাল হওয়ার বাসনা মধুসূদনের অন্তরে তখন বাসা বেঁধেছে। ঠিক এমন সময় খ্যাতনামা বাবু রামগোপাল ঘোষ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক সর্বোৎকৃষ্ট রচনার জন্য দুটি পদক দিতে প্রতিশ্রুত হন। পদক প্রাপকদের মধ্যে প্রথম হন মধুসূদন ও দ্বিতীয় ভুদেব মুখোপাধ্যায়। ৩ ইংল্যান্ড কবি প্রসবিনী সেক্সপীয়ার মিল্টন বাইরনের জন্মভূমি তাই ইংল্যান্ড মধুসূদনের কাছে ছিল স্বপ্নের দেশ কবি বিশ্বাস করতেন ইংল্যান্ডে গেলেই তাঁর কবিত্বশক্তির পূর্ণবিকাশ হবে। ইংল্যান্ড যাওয়া ও ইংরাজী সাহিত্যে জায়গা করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই ধর্মান্তরিত হন, জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু এই ধর্ম পরিবর্তনকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন- ' খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের ফলে মধুসূদনের পারিবারিক জীবনে সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। তাঁহার স্বদেশ ত্যাগ, মাদ্রাজ গমন, যুরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ, সাংসারিক অভাব, আত্মীয় স্বজনের স্নেহ হইতে বিচ্যুতি এবং অবশেষে দাতব্য চিকিৎসালয়ে মৃত্যু এ সমস্তই স্বল্পাধিক পরিমানে তাঁহার খীষ্ট্রধর্মের ফল।'৪ এদিকে ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে পিতৃদত্ত সাহায্য থেকে বঞ্চিত হওয়াই

মধুসূদনের কাছে সাহিত্য হয়ে ওঠে একমাত্র জীবন ও জীবিকার অবলম্বন। কিন্তু সাধের ইংরাজি সাহিত্য সেই যশ ও অর্থ কোনোটাই আনতে পারেননি। মাদ্রাজ গমন একরাশ স্বপ্ন নিয়ে 'ক্যাপটিভ লেডি' রচনা করার আগে পর্যন্ত যে ধারণা ছিল মধুসূদনের তা ভেঙ্গে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন ইংরাজি সাহিত্যে সুলেখক তিনি হতে পারেন কিন্তু জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী গৌরব লাভ করবেন একথা নিশ্চিত বলা যায়না। অবশেষে বেথুন সাহেব ও বন্ধু গৌরদাস বসাকের সুপরামর্শে বাংলা সাহিত্য রচনায় মন দিলেন। সৃষ্টি হল এক একটি স্বর্ণালি ফসল। প্রাচ্য-প্রাশ্চাত্যের কাব্যকুঞ্জ থেকে মধু আহরণ করে নির্মান করলেন- তিলোত্তমা সম্ভব, পদ্মাবতী, শর্মিষ্ঠা, মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনার মতো সৃষ্টি। এক অনন্য মধুমাখা মৌচাক। অবশেষে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে আট বছর প্রবাসের পর কলকাতায় কবির ফিরে আসা।

মধুসূদন ভালোবেসে পরকে আপন করতে পারতেন। কিন্তু অন্যের হাতে নিজেকে সমর্পন করতে শেখেননি। নিজের ইচ্ছের বশবর্তী হয়ে চলেছেন। অবশেষে ১৮৬২ সালে জুলাই মাসে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য ইংল্যান্ড যাত্রা যুরোপীয় ভাষাসমূহের শিক্ষালাভ ও এই যাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য। আর এখানেই ভয়ানক আর্থিক দূরবস্থার শিকার। প্রবাস মধুকবির কাছে সর্বনাশের নামান্তর। এই অর্থাভাবের দিনগুলোতে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আর এই মানুষটি না থাকলে মধুসূদনকে চূড়ান্ত অর্থকষ্টে কিংবা বিদেশের কোনো কারাগারে বা দরিদ্র নিবাসে জীবন কাটাতে হত। কবি যাদের ওপর বৈষয়িক কার্যের ভার দিয়েছিলেন তারা সেসব দায়িত্ব পালন করলেন না । এমনকি মধুসূদনের স্ত্রী হেনরীয়েটাও মাসিক অর্থসাহায্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। ফলে মধুসূদন স্ত্রী সন্তান নিয়ে অকূল সাগরে পড়েন। এই অবস্থায় তিনিও সন্তানদের নিয়ে মধুসূদনের কাছে চলে আসেন। অর্থাভাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের জন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ কতৃক প্রাপ্ত রৌপ্যপানপাত্র বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়েছেন। ইংল্যান্ডে খরচ বেশী তাই চলে গেলেন ফ্রান্সে সেখানেও একই অবস্থা। বার্সেল্‌সে অবস্থান কালে এই দূরবস্থা চরম রূপ ধারণ করে অবশেষে তিনি দয়ার সাগরের স্মরণাপন্ন হন তাঁকে পত্র প্রেরণ করেন। মধুসূদনকে এ যাত্রায় ১৫০০০ টাকা ঋণ করে পাঠিয়ে প্রাণে বাঁচালেন সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান। এই ঋণের কিছু অংশ মধুসূদন শোধ করতে পেরেছিলেন, সবটা নয়। মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু বলেছেন- 'দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে সাহায্য না করিলে মধুসূদন কখনই ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারিতেন না।'৫ মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে লেখা চিঠিগুলিতে প্রথমে Sir সম্বোধন করলেও পরবর্তীকালে Friend অর্থাৎ বন্ধু সম্বোধন করেছেন।৬ শুধু প্রবাসে নয় ১৮৬০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী কোচবিহার রাজ নরেন্দ্রনারায়ণ দেবের কাছে একটি চিঠি পৌঁছায় ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠির আবেদনপত্র, আবেদনকারী মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সুপারিশ লেখেন- "আমি একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পাঠাইলাম, দেখিও যেন বাতাসে উড়িয়া না যায়। শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা।"৭ বিদ্যাসাগরের জহুরী চোখ অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে চিনতে ভুল করেনি। কলকাতা হাইকোর্টে মধুসূদনের প্রবেশের ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের অবদান ছিল। কিন্তু ব্যারিস্টারীতেও তিনি কাঙ্ক্ষিত সফলতা পেলেন না।

কিন্তু একটা কৌতূহল থেকে যায় ,মধুকবির জীবনের শেষ দিনগুলিতে যখন পীড়িত অসহায় কবি অন্যের গৃহে মৃত্যুর অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন। সস্ত্রীক ব্যারিস্টার উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মনমোহন ঘোষ পীড়িত কবির সঙ্গ ছাড়েননি শেষদিন পর্যন্ত। ১৮৫৬ সাল থেকে মধুসূদন ও বিদ্যাসাগরের পরিচয়,

যদিও তখনও তাদের সম্পর্ক গাঢ় হয়নি। ১৮৬০ সালে তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য প্রকাশিত হলে বিদ্যাসাগর এ কাব্যের সমালোচনা করেন। বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে মধুসূদন লেখেন- 'আমি শুনেছি বিদ্যাসাগর এ কাব্যের অবজ্ঞাভরে সমালোচনা করেছেন।' আসলে রাজা রামমোহন ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে বাংলাদেশে যেমন বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন তেমনি মধুসূদনও তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যের মধ্যে দিয়ে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এক বড় কাল আনলেন। এতবড় বদল তৎকালীন বঙ্গসমাজের বিদ্যাসাগরের মত বিদ্বজনেরা ঠিক গ্রহন করতে পারেননি। মধু জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন-'নিন্দা অবজ্ঞা এবং উপহাস অজস্রধারে তাঁহার উপর বর্ষিত হইয়াছিল। একদিকের গুপ্তকবি শিষ্যদল অপরদিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী এবং সেইসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের ন্যায় ইংরাজী সাহিত্যে পারদর্শী ব্যাক্তিগন সকল সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহাকে উপহাস ও বিদ্রুপ করিয়াছিলেন।'৮ কিন্তু এই অবজ্ঞা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। পরবর্তীকালে মধুকবির মধ্যে বিদ্যাসাগর খুঁজে পান 'গ্রেট মেরিট'। মধুসূদনের বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে যাবার সক্রিয় সমর্থক ছিলেন বিদ্যাসাগর। আর প্রবাসে এই মানুষটি না থাকলে সত্যিই অকালে খসে পড়ত একটি তারা। ১৮৬০ মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য প্রকাশিত হলে বিদ্যাসাগর কাব্যের বিরূপ সমালোচনা করেন। বন্ধু রাজনারায়ণকে এক পত্রে মধুসূদন লিখেছেন- 'আমি শুনেছি বিদ্যাসাগর এই কাব্যের অবজ্ঞাভরে আলোচনা করেছেন।' ১৮৬৪-৬৬ মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে ২১ টি চিঠি লিখেছেন, ফ্রান্স থেকে ১৩ টি লন্ডন থেকে ৭টি। ১৮৬৪ থেকে ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে ২১ টি পত্র লেখেন অসহায় মধুর চিঠি পড়ে বিদ্যাসাগরের মনে কী প্রতিক্রিয়া হত এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বিহারীলাল সরকার লিখেছেন- 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সত্য-সত্যই মাইকেলের সেই পত্র পাঠ করিতে করিতে রুদ্ধকণ্ঠে অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিলেন।' ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত বিদ্যাসাগর গ্রন্থে তিনি লিখেছেন- 'হস্তে এক কপর্দ্দক ও ছিল না, কিন্তু ছয় সহস্র টাকা ঋণ করিয়া তিনি মাইকেলকে পাঠাইয়া দেন।'৯ শুধু কী অর্থ সাহায্য ? বিনয় ঘোষ তাঁর 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন বিদ্যাসাগর ছোট আদালতে জজ পদে মধুসূদনকে চাকরী দেয়ার চেষ্টা করে ছোটলাটকে পত্র লেখেন। বিদ্যাসাগরের মতো সুহৃদ মধুসূদনের আর কেউ ছিল না। সত্যিকারের বন্ধু ও সত্যনিষ্ঠ মানুষটিকে বীরাঙ্গনা উৎসর্গ করেন এবং উৎসর্গপত্রে লেখেন- 'বঙ্গকুলচূড় শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের চিরস্মরণীয় নাম এই অভিনব কাব্যশিরে শিরোমণিরূপে স্থাপন করিয়া, কাব্যকার ইহা উক্ত মহানুভবের নিকট যথোচিত সম্মানের সহিত উৎসর্গ করিল।' আসলে মাইকেল দেশে ফিরে তাঁর পরম বন্ধুটির সঙ্গে প্রীতিকর ব্যবহার করতেন না। বারবার ঋণ শোধ করতে করতে ক্লান্ত বিদ্যাসাগর ১৮৭২ সালে সেপ্টেম্বর মধুসূদনকে একটি চিঠিতে লেখেন- 'তোমার আশা ভরসা নাই। আমি কি আর কেহই তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তালি দিয়া আর চলিবে না।' জানতে ইচ্ছা করে মধুকবির মৃত্যুতে বিদ্যাসাগরের ওপর কী প্রভাব পড়েছিল ? জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায় মধুসূদনের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার্থে অর্থসাহায্যের জন্য বিদ্যাসাগরের কাছে গেলে তিনি অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে বলেন- 'দেখ প্রাণপন চেষ্টা করিয়া যাহার জান্ রাখিতে পারি নাই তাঁহার হাড় রাখিবার জন্য আমি ব্যস্ত নই...।'বিদ্যাসাগর তাঁকে রক্ষা করতে পারেননি ঠিকই কিন্তু এই মানুষটা না থাকলে অনেক আগেই মধুসূদনের মতো ধ্রুবতারা ঝড়ে পড়তো।

মধুসূদনের চিঠি আত্মকথায় ঠাসা, তিনি যে আত্মজীবনী লেখেননি তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি; কারন তার চিঠিপত্রই তার অঘোষিত আত্মজীবনী। 'গৌরদাস তুমি আমার জীবনী লিখবে কারন আমি ত একজন মহাকবি হবই।'১০ পরবর্তীকালে গৌরদাস সত্যিই আত্মজীবনী লিখতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। মধুসূদনের চিঠিপত্র অধিকাংশ ইংরাজীতে লেখা গৌরদাস বসাক, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, মনোমোহন ঘোষের কাছে মধুসূদন চিঠিপত্র লেখেন। কেশব চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকেও কিছু চিঠিপত্র পাওয়া যায়।১১ জীবনের কঠিন সময়ে সব দহন জ্বালায় একা জ্বলেছেন। বন্ধু গৌরদাস কাছে নেই, রাজনারায়ণ শুধু সাহিত্য প্রসঙ্গের আলাপচারী বিদ্যাসাগর শুধু প্রয়োজনের আশ্রয় বা মহত্বের আধার, যতীন্দ্রমোহন শুধু গ্রন্থ রচনার উৎসাহদাতা। 'বিদ্যাসাগর যেমন বহির্মুখী তেমন অন্তর্মুখী। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের সমর্থক কিন্তু তিনি কোনো সভায় বক্তৃতা দেননি, কোন পুস্তিকা লেখেননি।'১২ মাদ্রাজে চার-চারটি সন্তানকে ফেলে চলে এলেন কোনোদিন খবর নিলেন না তার কি ব্যাখ্যা আছে?

মধুসূদন স্বাচ্ছন্দের কবি নন, নন স্বচ্ছলতার শিল্পী অথচ তার কাব্যে ঐশ্বর্য আর সম্পদের নিত্য ছড়াছড়ি। বিষয়ে ঐশ্বর্য, ভাষায় ঐশ্বর্য, ছন্দে ঐশ্বর্য। সম্পদ আর ঐশ্বর্য এই স্বভাব দরিদ্র কবির আজন্ম ইপ্সিত ও আমরণ কৌতুকবিলাস। 'আমি শুধু বাঙ্গালী নই; আমি বাঙ্গাল যশুরে বাঙ্গাল।' আমাদের অবাক করে না। ১৩ কোলকাতায় মধুসূদনের কোনো চাকরী হল না বাবা মাসোয়ারা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন বইপত্র বেঁচে হাত খরচ চালাতে হচ্ছে। রাজনারায়ন দত্ত আর টাকা পয়সা দেবেন না; মধুসূদনের আর চাইবার প্রবৃত্তি নেই। যে কুকর্ম করেছেন মায়ের কাছে চাইবার মুখও আর নেই। তিনিই যেন অপরাধী সবাই ভাবছে মায়ের দুর্গতির জন্য তার দায়িত্ব সর্বাধিক। ১৪ মধুসূদন বর্ধমানের মহারাজার সভাকবি হতে চেয়েছিলেন সেইসঙ্গে কৃষ্ণনগরের মহারাজের কাছেও প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ভারতচন্দ্র, কবিকঙ্কন, ঘনরাম, কৃত্তিবাসের সময়ে সাহিত্যচর্চাকে বৃত্তি হিসাবে মেনে নিলেও এযুগের মানুষ কবিকে গ্রহন করতে পারেননি। মধুসূদনের দুর্দশা একান্তভাবে স্বকৃত,কারন তিনি অমিতব্যায়ী। কবি বিদ্যাসাগরকে লিখেছেন-'তুমি শুনলে খুশি হবে আমি ফরাসী জেলবাসের অপমান পরিহার করতে পেরেছি জনৈকা তরুণী ফরাসী ভদ্রমহিলার কৃপায়। তিনি সুন্দরী ও দয়াদ্রা। তাঁর সঙ্গে আমার ট্রেনের কামরায় আলাপ হয়েছিল তারপর থেকে তিনি আমাদের সম্বন্ধে দারুণ কৌতূহল প্রকাশ করেন। আমাদের দুঃখের দিনে সান্ত্বনা দেন, অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িওয়ালার কাছে যান, তাঁকে তিনি অনুনয় বিনয় করলেন যা শুধু একজন ফরাসী ভদ্রমহিলার পক্ষেই সম্ভব।'১৫ 'তুমি যদি একজন সাধারণ লোক হতে তাহলে আমি চিঠি শুরু করতাম গুছিয়ে সাজিয়ে ক্ষমা চেয়ে। কারণ এত দিন কেন চিঠি লিখিনি? কিন্তু তুমি তো জানো বিপদের দিনে আমরা কখনই সে লোকের কাছে যাই না যাকে আমরা আমাদের বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে সবচেয়ে খাঁটি এবং সবচেয়ে আন্তরিক লোক বলে মনে না করি।'১৬ বিদ্যাসাগরের চিঠি - 'I tell my wife that when I get back to culcutta, you will give me a little room in your house and a lot of rice to keep body and soul together' ১৭ প্রাচ্যে জন্মেও তার মনন ও মানসিকতা গড়ে উঠেছিল পাশ্চাত্য সভ্যতা ও মূল্যবোধে। পাশ্চাত্যকে আলিঙ্গন করতে গেছেন তখন প্রাচ্যের কথা মনে পড়েছে আবার লক্ষ্মী সরস্বতীর মধ্যে কোনো একটিকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি জীবনকে নানা ভোগোপকরণে উপভোগ করতে

চান চিরকাল তিনি মনে মনে ইংল্যান্ডে বিচরণ করেছেন, স্বদেশের অনেক কিছুকেই অন্তর দিয়ে ঘৃণা করেছেন।

কলকাতায় হেনরিয়েটার জন্য ১৫০ ও লন্ডনে তার নিজের জন্য আড়াইশো টাকা এই মোট চারশো টাকা করে মাসে পেলে তিনি বেশ স্বচ্ছন্দে ব্যারিষ্টারী পড়া শেষ করতে পারবেন। ফ্রান্সের ভার্সাইতে খরচ ১০০ টাকা কম হবে কিন্তু তিনি সে টাকা সংগ্রহ করতে অপারগ। বিদ্যাসাগর ও গৌরদাসকে লেখা চিঠিতে ইংল্যান্ডের আবহাওয়াকে দোষারোপ করেছেন। বর্ণবাদী ইংরাজদের প্রভুসুলভ মনোভাবকে হৃদয় থেকে মেনে নিতে পারেননি মধুসূদন। তিনি জীবনে বহুবার ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন- খ্রীষ্টান হওয়া, মাদ্রাজে যাওয়া, হেনরিয়েটার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, রেবেকা ও সন্তানদের ত্যাগ করে চলে আসা, ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত আসা সবই একধরনের ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত। ১৮ বিদ্যাসাগরকে পরপর চারটি চিঠিতে মধুসূদন বারংবার অনুরোধ করেন তাঁর সম্পত্তি বন্ধক রেখে টাকা পাঠানোর জন্য। মধুসূদনের সম্পত্তির বার্ষিক খাজনা আদায় হয় ১৫০০ টাকা। বিদ্যাসাগর যেন সেই সম্পত্তি ক্যালকাটা ল্যান্ড মর্টগেজ কোম্পানির কাছে বন্ধক রেখে অবিলম্বে ১৫ হাজার টাকা তোলার চেষ্টা করেন। সেখান থেকে দু-হাজার টাকা যেন ফ্রান্সে পাঠান, আর কোলকাতায় যে চার হাজার টাকা ঋণ আছে সেটা শোধকরে বাকী ৯ হাজার টাকা যতদুর সম্ভব তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেন। ১৯ মধুসূদন যত টাকা চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের পক্ষে তা জোগাড় করা সম্ভব ছিল না। কবি নিজেও জানতেন এতো টাকা হয়তো জোগাড় করা সম্ভব হবে না। 'হায়রে,আমাকে এতো টাকা দেবে কে? আপনি যদি ধনী হতেন, তা হলে আমার অবস্থা এতো করুন হতো না, আমি তো আপনার উদার হৃদয়ের কথা জানি'। ২০ অপর একটি চিঠিতে লিখেছেন- 'আমার অবশ্যই আপনাকে বলা দরকার যে, আপনি যদি আমার সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে টাকা জোগাড় না-করেন তাহলে আমার পক্ষে এখানে বেঁচে থাকা অথবা ব্যারিস্টার হয়ে ভারতে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না।'২১

জীবনে অধিকাংশ সময়ে মাইকেল অর্থকষ্টে ভুগেছেন দেনার দায়ে জেলে যাবার উপক্রম হয়েছেন। কবিকে দেনার উপর দেনা করেতেও দেখা গিয়েছে। মাইকেলের ব্যারিস্টারি পড়া বন্ধের উপক্রম হলে বিদ্যাসাগর তাকে সহযোগিতা করেন। ১৮৫৬ সালে তাদের প্রথম পরিচয় হয় ১৮৬৬ সালে ব্যারিস্টারি পাশ করে কলকাতায় প্র্যাকটিস শুরু করেন কিন্তু অমিতব্যায়িতা ও বন্ধুদের আপ্যায়নে অনেক অর্থ ব্যয় করেন । মধুসূদনের জীবনীকার বলেন 'বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি সাহায্য না করিতেন তাহা হইলে মাইকেলকে নিশ্চিতই অনাহারে মরিতে হইত।' মধুসূদনের জীবনে দারিদ্র্য ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শের ফলশ্রুতি তিনি অল্পে তুষ্ট থাকেননি, রাজকীয় জীবন সম্ভোগ কামনা করেছেন সেইসঙ্গে কাব্যযশ পেতে চেয়েছেন। কাব্যযশ এসেছে কিন্তু অর্থকষ্ট ঘোচেনি। ২২ 'এদেশে কৌপীন মাত্র সম্বল করে কাঁচকলা আর আতপচাল সিদ্ধ খেয়ে জীবন যাপন করাটাকে যাঁরা আদর্শ স্থানীয় মনে করেছেন, মধু তাঁদের থেকে পৃথক।' ২৩ মধুসূদনের আদর্শ হল প্রচুর ঐশ্বর্য এবং অপর্যাপ্ত ভোগোপকরণ অর্জন। ভোগবাসনার কথা গৌরদাসকে চিঠিতে বলেছেন। জীবনে ভোগ বাসনার মোক্ষধাম ইউরোপ বলে মনে করেন মধুসূদন। মধুসূদন দত্ত একটি চিঠিতে লিখেছেন- 'আমার সহকর্মী বাবু মূর্তিলাল চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে তোমার কাছে যাব। তুমি এক বোতল শেরি আনিয়ে রেখো।'

তিনি আনিয়েছিলেন কিনা জানা নেই- তবে মাইকেলের পক্ষেই এমন আবদার বিদ্যাসাগরকে সম্ভব। কত কাছের সম্পর্ক হলে এমন আবদার করা যায় তা এ কথায় স্পষ্ট।

মাইকেল মধুসূদন ও বিদ্যাসাগর উনিশ শতকের নবজাগরণের আলোয় আলোকিত বাংলার দুই কান্ডারী। একজন সোনার চামচ মুখে জন্মগ্রহন করে ভগ্যের পরিহাসে সহ্য করেছেন দারিদ্রের জ্বালা। অন্যজন আজীবন দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে আর্ত মানুষের পাশে থেকে হয়ে উঠেছিলেন 'দয়ার সাগর'। স্বভাবগত দিক থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর এই দুই মানুষের মধ্যে গড়ে উঠলো বন্ধুত্ব। কিন্তু সেই সম্পর্ক কী আজীবন ছিল? মধু কবির হৃদয়ের মতো তাঁব কবিতাতেও বিদ্যাসাগরের স্থান ছিল। আবার প্রবাসে অসহায় মধুসূদনের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এই সিংহপুরুষ। এইভাবে উনিশ শতকের এই দুই আলোকবর্তিকা পরস্পরের কাছে এসেছেন। শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়েছেন। বাংলার ইতিহাস আলোড়িত হয়েছে এই দুই কৃতি বাঙালীর সম্পর্কের পৌষ ফাগুন পালায়।

তথ্যসূত্রঃ

১। ekhonkhobor.com>2020/06/29>modhukobi-chondo.‘মধুকবি ছন্দ ও বিতর্ক শেষের দিনগুলি’ রানা চক্রবর্তী।

২। বসু যোগীন্দ্রনাথ, দে’জ পাবলিশিং, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ-১৮৯৩, পৃষ্টা- ১৩

৩। তদেব পৃষ্টা- ৭৯

৪। তদেব পৃষ্টা- ৯৭

৫। তদেব পৃষ্টা- ৩৭০

৬। তদেব পৃষ্টা- ৩৭৪-৭৬

৭। খান চৌধুরী আমানত উল্লা আহমদ, কোচবিহারের ইতিহাস, সম্পাদনা রণজিৎ দেব, পারুল প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০১৬, কলকাতা-০৪,পৃষ্ঠা-৪১৭-১৮

৮। বসু যোগীন্দ্রনাথ, দে’জ পাবলিশিং, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, প্রথম প্রকাশ- ১৮৯৩, পৃষ্টা-২০৩

৯। তদেব পৃষ্টা-১৪

১০। অধ্যাপক মৈত্র সুরেশ চন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবনী ও সাহিত্য, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ৯ বাংলাবাজার ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৭ পৃষ্টা-২৪

১১। সোম নগেন্দ্রনাথ, মধুস্মৃতি, দীপ প্রকাশন, ২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট কলিকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ ভারতবর্ষ ১৩২১-১৩২৪, পৃষ্টা-১০

১২। অধ্যাপক মৈত্র সুরেশ চন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবনী ও সাহিত্য, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ৯ বাংলাবাজার ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৭ পৃষ্টা-৩২

১৩। তদেব পৃষ্টা-১৪৮

১৪। তদেব পৃষ্টা-৮৯

১৫। দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদনাঃ, মধুসূদন সাহিত্য প্রতিভা ও শিল্পী ব্যক্তিত্ব, পুথিপত্র ৯ এন্টনী বাগান লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ ৫ই অক্টোবর ১৯৫৬ পৃষ্টা-২২০

১৬। অধ্যাপক মৈত্র সুরেশ চন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবনী ও সাহিত্য, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ৯ বাংলাবাজার ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৭ পৃষ্টা-২১৮

১৭। তদেব পৃষ্টা-৩৭, ১২১ নং পত্র

১৮। মুরশিদ গোলাম, আশার ছলনে ভুলি, আনন্দ পাবলিশার প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা -২৬, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-২৪৯

১৯। তদেব পৃষ্ঠা-২৪৯

২০। তদেব পৃষ্ঠা-২৮৭

২১। তদেব পৃষ্ঠা-২৫৩

২২। ক্ষেত্রগুপ্ত কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী, গ্রন্থনিলয়, মহাত্মা গান্ধীরোড কলিকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৩৭০, পৃষ্টা-৩৮

২৩। অধ্যাপক মৈত্র সুরেশ চন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবনী ও সাহিত্য, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ৯ বাংলাবাজার ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৭ পৃষ্টা-১৬০